এই লেখাটি "দি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট" এর ৮ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা প্রতিরোধে চাই সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন

সেলিনা ফাতেমা বিনতে শহিদ
চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী ও সহকারী অধ্যাপক
মনোরোগ বিদ্যা বিভাগ
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়,ঢাকা।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, স্বাস্থ্য হলো সর্বপরি শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সুস্থতা। সুতরাং এ কথা স্পষ্ট মানসিক স্বাস্থ্য ছাড়া কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী বা স্বাস্থ্যবান বলা যাবে না। আবার মানসিক রোগের অনুপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও একজন ব্যক্তি মানসিকভাবে স্বাস্থ্যবান নাও হতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে সবসময় সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগা, অতিরিক্ত রাগ, হীনমন্যতা, আত্মবিশ্বাসের অভাব এগুলো কোন রোগ নয় তবে এই সমস্যায় ভোগা ব্যক্তিদের মানসিকভাবে স্বাস্থ্যবান বলা যায় না। আর ব্যক্তির মধ্যে এ ধরনের মানসিক সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার পেছনে রয়েছে পরিবার, পারিপার্শ্বিকতা ও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। শুধুমাত্র মানসিক সমস্যাই নয় মানসিক রোগের পিছনেও শারীরিক কারণ ছাড়াও পরিবার, পরিবেশ ও সমাজের প্রভাব অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ জন্মগ্রহণ করে ও বেড়ে ওঠে তার পরিবারে। একেকটি পরিবারের সমষ্টি এবং পরিবেশ নিয়েই সমাজ। আর এই পরিবারের নিয়মকানুন ও শিশু লালন-পালন প্রক্রিয়া সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি যদি হয় অজ্ঞানতা, বৈষম্য ও কুসংস্কারে পরিপূর্ণ তাহলে তা ব্যক্তির মানসিক সুস্থতা গড়ে তুলতে অন্তরায় হবে। পাশাপাশি তা কখনো কখনো ব্যক্তিকে মানসিকভাবে অসুস্থ ও রোগগ্রস্থ করে তুলতে পারে। আমি এ ধরনের অসংখ্য কেস দেখেছি যার পিছনে মূলত পরিবার পরিবেশ ও সমাজ দায়ী, এরকম দুটি কেস বর্ণনা করছি যা থেকে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে।

কেস স্টাডি -১ :

রাসেল, বয়স ২৪, অনার্সের ছাত্র। দেখতে সুদর্শন। ছয়াবোনের মধ্যে সেই বাবা মার একমাত্র ছেলে সন্তান। যে সমস্যাটির জন্য তাকে সাইকোথেরাপীর জন্য পাঠানো হয়েছিল সেটা ছিল – কিছু নির্দিষ্ট পরিবেশে তোতলামি যার কোন শারীরিক ভিত্তি নেই, সামাজিক পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়াতে না পারা, পড়াশোনায় অমনোযোগ, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশাব্যাঞ্জক চিন্তা, আত্মবিশ্বাসের অভাব, হীনমন্যতায় ভোগা। চিকিৎসার প্রথম পর্যায়ে আমি তার পারিবারিক তথ্য নিতে গিয়ে জানতে পারি যে তার পরিবার ছিল খুবই রক্ষণশীল।

তাকে পড়াশুনার বাইরে কারো সাথে মিশতে দেয়া হতো না। তার উপর সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়া হতো। তাকে কখনো প্রশংসা করা হতো না বরং সবসময় তার ভুলগুলোই ধরিয়ে দিয়ে তাকে কটুক্তি করা এবং অন্যদের সাথে তুলনা করা হতো। যদিও সে বরাবরই পরীক্ষায় মোটামুটি ভাল ফলাফল করতো, তারপরও পরিবারের কেউই তাতে সন্তুষ্ট হতো না। বরং আরো ভাল ফলাফল হলো না কেন এ নিয়ে তিরস্কার করা হতো। এর ফলে ধীরে ধীরে ছেলেটি নিজের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে। সারাক্ষণ পড়াশুনা করেও তার মনে হয়, কিছুই হলো না। সে ভাবতো সে অন্যদের মত না, তার অনেক সমস্যা আছে। সে যখন স্কুল পেরিয়ে কলেজে প্রবেশ করলো এবং তার গণ্ডি যখন কিছুটা বড় হলো যেখানে সবার সাথে মেশা প্রয়োজন, নিজ থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন, তখন দেখা গেল সে মিশতে পারে না, কারো সামান্য কোন মন্তব্যে খুব কষ্ট পায়, হীনমন্যতায় ভোগে, সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। মনে করে সে অন্যদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে। এই আত্মবিশ্বাসের অভাবের কারণেই তার তোতলামি শুরু হয়, উর্ধ্বতন, অপরিচিত মেয়েদের সামনে তার খুবই নার্ভাস লাগে। এ কারণে সে নিজেকে একেবারেই গুটিয়ে ফেলে। অনেক পরিস্থিতি এড়িয়ে চলে। আর এসব নিয়ে হতাশার কারণে তার পড়াশুনাও ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

এই কেসটি পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই ছেলেটির নিজের পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গিই তার মধ্যে মানসিক সমস্যা তৈরিতে প্রভাব বিস্তার করেছে। আমাদের সমাজে এখনও প্রচলিত কিছু ভুল ধারণার কারণে এবং সঠিক লালন-পালন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারণেও সন্তানের সর্বোচ্চ ভাল চেয়েও বাবা-মা তাদের লক্ষ্যে পৌছতে পারছেন না। কেউ কেউ অতিরিক্ত রক্ষণশীল হচ্ছেন কেউ আবার একেবারেই স্বাধীন করে দিচ্ছেন। এখনও মনে করা হয় পড়াশুনার বাইরে অন্যকিছুতে মনোযোগ দেয়া ঠিক না, প্রশংসা সামনা-সামনি করা যাবে না। ছোটদের মতামত থাকতে নেই, বড়রা যা বলবে তাই ঠিক, অন্যের সাথে তুলনা করলে মনে জেদ বাড়বে ফলে তার মধ্যে প্রতিযোগীতাপূর্ণ মনোভাব তৈরি হয়ে সে আরো ভাল করবে। অথচ ভাল কাজের প্রশংসা না শুনে আর কটুক্তি শুনতে শুনতে ব্যক্তি আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, হীনমন্যতায় ভোগে, কারো কারো মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও রাগের সৃষ্টি হয়। আবার দেখা যায় একই পরিবারে ভিন্ন ভিন্ন সদস্য ভিন্ন মত পোষণ করছেন এবং সেটা শিশুর উপর প্রয়োগ করছেন। এর ফলে কোনটি যে সঠিক? শিশুটির কি যে করা উচিত? সেটা বুঝতে না পেরে সে কোন নিয়মই মানে না এবং উশৃংখল হয়ে পড়ে।

যদিও আমাদের সমাজে শিশুকে মারধর ও মৌখিকভাবে তাচ্ছিল্য না করার ব্যাপারে অনেক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে তথাপি এই পরিবর্তন ততটা উল্লেখযোগ্য নয়। মনে করা হয়, না মেরে বা না বকে বাচ্চা মানুষ করা যায় না। অথচ মারধর; যে কোন ভুলের জন্য বকাঝকা বাচ্চার মনের উপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। বলা হয় আগেকার শিশুরাতো এভাবেই মানুষ হতো। যুগ পাল্টেছে আগের শিশুরা এটাকেই স্বাভাবিক ভাবতো কিন্তু এখন স্যাটেলাইটের যুগে এবং অন্যান্য সচেতন, মা-বাবার আচরণ দেখে শিশুরাও অনেকখানি বুঝতে শিখেছে, যার ফলে সহজেই তারা ধরতে পারে কোনটা ঠিক এবং ঠিক নয়। আর যখন তারা ভুলের শিকার হয় তখন তাদের মনের উপর চাপ পড়ে বেশী। তাই এই অর্থে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে অবশ্যই সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে পরিবারে ও সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তনের প্রয়োজন।

কেস স্টাডি - ২ :

তানিয়া, বয়স ৩৭, ডিগ্রি পরীক্ষার পরই ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও পাত্রপক্ষের অতিরিক্ত আগ্রহের জন্য বাবা মা তাকে বিয়ে দেয়। তার স্বামী হাসান ব্যবসায়ী। ব্যবসার প্রয়োজনে তাকে ঢাকায় থাকতে হয়। তানিয়া থাকে শাশুড়ি, ননদ ও জায়ের সঙ্গে গ্রামের বাড়ীতে।

শাশুড়ি, ননদ ও জা তিনজনের কেউ শিক্ষিত নন। তানিয়া শিক্ষিত ও তার বাবার বাড়ীর অবস্থা হাসানের পরিবারের চেয়ে বেশ ভাল। অথচ এরপর সে প্রতিনিয়ত শাশুড়ি ও ননদের বাক্যবাণে জর্জরিত হতে থাকে। তার প্রতিটি কাজের সমালোচনা করা, তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা এ যেন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। তানিয়া কোন কথারই কোন প্রতি উত্তর করে না কারণ উত্তর দিলেই ঝগড়া লেগে যাবে। তখন বাড়ীর বউ ঝগড়া করে বলে সমাজের লোকজন তাকে নিন্দা করবে। হাসান ১৫ দিনে কখনো মাসে ১ বার বাড়ীতে আসে। তানিয়া তাকে সব খুলে বলে কিন্তু সে সব কিছু বুঝেও এ ব্যাপারে কোন কথা বলে না। ভাবে মা, বোন কষ্ট পাবে। বউয়ের পক্ষ নিয়ে কথা বললে লোকে তাকে খারাপ বলবে। এভাবে দিন যায় একে একে ১৫ বছর কেটে যায়। তানিয়া তিন সন্তানের মা হয়। সংসারের ফাঁকে সে একটা এনজিওতে চাকরি নেয়। এক সময় সে ঢাকায় স্বামীর কাছে এসে থাকে। কিন্তু সে ধীরে ধীরে অসুস্থ হতে থাকে। প্রচণ্ড শরীর জ্বালাপোড়া, সমস্ত শরীর ব্যথা, মাথা ব্যথা, সারাক্ষণ অস্থিরতা, রাতে ঘুম না হওয়া, কোন কিছুতে আগ্রহ পায় না, কাজ কর্ম কিছুই করতে পারে না। খিটখিটে মেজাজ। অসংখ্য ডাক্তার দেখানোর পরও যখন অবস্থার কোন উন্নতি হচ্ছিল না তখন তাকে মানসিক বিভাগে পাঠানো হয়। তথ্য নিতে গিয়ে জানতে পারি দীর্ঘদিন ধরে তার শাশুড়ি, ননদের আচরণ এবং স্বামীর নির্লিপ্ততা তাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। প্রতিনিয়ত তার পুরোনো কথাগুলো মনে পড়তো, বিশেষ করে স্বামীর আচরণ, যে কিনা এত আগ্রহ করে তাকে বিয়ে করেছিল সে তার পক্ষে কোনই কথা

বলেনি বরং মা বোন যা যা বলেছে তাই করেছে। তানিয়া চাকরি করতো বলে তাকে তার প্রয়োজনীয় বা শখের কোন জিনিস কিনে দিত না; আগ্রহ করে মন খুলে কোন কথা বলতো না। গল্প করা, বেড়াতে নিয়ে যাওয়া কিছুই করতো না, অথচ স্বামীকে নিয়ে তার কতই না আশা, স্বপ্ন ছিল, এমনকি হাসান ছেলেমেয়ে বড় হয়ে গেছে বলে তার কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতো। এগুলো নিয়ে তানিয়ার ছিল চরম হতাশা। তানিয়া ঝগড়া করতে পারে না। কিন্তু তার মনের কথাগুলো স্বামীকে সে বুঝিয়েও বলেছে কিন্তু তাতেও কোন কাজ হয়নি। সে তার মত চুপচাপ থেকেছে। এর ফলে তানিয়া দিনে দিনে আরো অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আমার কাছে যখন আসে তখন সে হাসপাতালে ভর্তি রোগী। এক মুহূর্ত স্থির হয়ে বসতে পারছে না ছটফট করছে আর শারীরিক সমস্যার কথা বলছে। যখন প্রথম তাকে জিজ্ঞেস করি পরিবারে কোন সমস্যা আছে কিনা সে বলেছিল কোন সমস্যাই নেই, সব ঠিক আছে শুধু শরীরে অশান্তি।

কেসটি পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই আমাদের দেশে এই চিত্রটি খুব সাধারণ। আমাদের সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি হলো মেয়েদের এরকম লাঞ্ছনা, অপমান, শশুড় বাড়ীতে সহ্য করতেই হয়। এর মধ্যে থেকেই তাকে সবকিছু ম্যানেজ করতে হবে, সবাইকে আপন করে নিতে হবে। তবেই সে ভাল মেয়ে। একটা মেয়ে যখন বাবার বাড়ীতে আদরে বড় হয় তখন আগে থেকেই হুশিয়ার করা হয়-শশুড় বাড়ীতে এসব চলবে না। তাকে শেখানো হয় শশুড়, শাশুড়ি, স্বামীকে আপন করে নেয়ার দক্ষতা। বিয়ের আগেই তার মগজে ঢুকানো হয় স্বামী তোমার সব। অপর পক্ষে একটি ছেলেকে তার বোধ হওয়া থেকে প্রস্তুত করা হয় বউকে কি ভাবে প্রশ্রয় না দেয়া হয়। বিয়ের আগ থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা হয় বউ এলে তো তার আঁচলে চলে যাবি। এ যেন বড়ই লজ্জার কথা। তখন থেকে ছেলে বুঝতে শেখে বউ প্রয়োজনের জিনিস এবং বেশী না। যদিও শিক্ষিত সমাজে এর যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে তথাপি এই পরিবর্তন গোটা সমাজ বিচার করলে উল্লেখযোগ্য নয়। এর ফলে আপাতদৃষ্টিতে অনেক ক্ষেত্রেই কোন সমস্যা হচ্ছে না বলে মনে হয়। কারণ সর্বংসহা নারীরা সব রকম, অন্যায়, অপমান মেনেই সংসার করে যান। তাও আবার সংসার করতে না পারলে সমাজ তাকেই ধিক্কার দিবে এই ভয়ে। আর সংসারে টিকে থাকার যুদ্ধে কেউ কেউ ছলনার আশ্রয় নেন, কেউ কেউ প্রতিবাদী হয়ে উঠেন। মেয়েদের চুপ থাকা যে সমাজে ভাল মেয়ে বলে অভিহিত সেখানে ছলনা জয়ী হয়। প্রতিবাদী খারাপ বলে ধিকৃত ও আরো বেশী অত্যাচারিত হয়। এতে কতটা উপকৃত হয় একটা সমাজ?

কারণ এই শাশুড়ি এক সময় বউ ছিলেন তিনিও হয়ত নানান প্রতিকূলতার মধ্যে সংসার করে এসেছেন তাই যেটা অত্যাচার সেটাকে স্বাভাবিক ভাবছেন। এখন সেই ব্যবহার আবার ছেলের বউয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। এই ননদটিও আবার তার সংসারে গিয়ে একই জিনিস ভোগ করবেন এবং এটাকেই স্বাভাবিক ভাববেন। কিন্তু এর ফলে মনের উপর যে চাপ পড়ছে সেটা কেউ তলিয়ে দেখেন না।

সবাই হয়ত তানিয়ার মত মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে যাবেন না। তানিয়া সচেতন, শিক্ষিত নারী ছিলেন বিধায়, অন্যায়গুলো হজম করতে তার কষ্ট হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ নারী যারা এগুলোকে স্বাভাবিক ভাবেন তারা কতটা মানসিকভাবে সুস্থ আছেন?

সন্তানকে মারধর করা, গালিগালাজ করা, স্বামীর সাথে ঝগড়া এগুলোর অধিকাংশের পিছনে থাকে এধরনের অন্যায়ের শিকার হয়ে নিজের প্রতি, অন্যের প্রতি গোপন ঘৃণা, বিতৃষ্ণা যা সুষ্ঠুভাবে সন্তান লালন, পরিবারের সুন্দর পরিবেশ বজায় রাখার পেছনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আবার যারা মিথ্যাচার, কৌশল করে টিকে থাকেন তাদের সন্তানরাও সুশিক্ষা না পেয়ে, সত্যবাদিতা, স্বচ্ছতার পরিবর্তে মিথ্যাচারী ও কৌশলী হতে শেখেন। আমি অধিকাংশ মহিলাদের বলতে শুনি এই ব্যাপারটি আমার স্বামী জানেনা। এমনকি শশুড় বাড়ীতে লুকিয়ে অনেক কাজ করে মেয়েরা। কিন্তু কেন এই মিথ্যাচার, লুকোচুরি? সাধারণত মায়ের সান্নিধ্যে বেশী থাকে সন্তান আর শিশুরা অনুকরণ করে বেশী। সে যা দেখে তাই শেখে। যেহেতু শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। এই শিশুরাই বড় হয়ে যেকোন বিষয়ে দুর্নীতির আশ্রয় নিতে দ্বিধাবোধ করে না, সহজেই মিথ্যাচার করে, স্বচ্ছতার পরিবর্তে কৌশলের আশ্রয় নেয় যা মোটেই সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। এবং এরাই দেশের উপকারের চেয়ে অপকার করে বেশি। আমাদের দেশ গরীব। ১৮ বছরের উপরে ২.২৫ কোটি লোকই মানসিক রোগে ভুগছে। এর মধ্যে ৯০%-ই প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও চিকিৎসা নিতে পারছেনা। তার একটি অন্যতম প্রধান কারণও অজ্ঞতা, মানসিক রোগ বিষয়ে অসচেতনতা ও কুসংস্কার। এছাড়াও প্রতি ১.৪০ লক্ষ মানুষের জন্য মাত্র ১জন সাইকিয়াট্রিস্ট এবং সারাদেশে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট মাত্র ১৭ জন। স্বাস্থ্য বাজেটের মাত্র ০.৫% এই খাতে খরচ করা হয়। এই অবস্থা থেকেই সহজে অনুধাবন করা সম্ভব সবার ক্ষেত্রে মানসিক রোগ নিরাময় করা কত দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাই নিরাময়ের পাশাপাশি প্রতিরোধের দিকে জোর দেয়া প্রয়োজন। আমরা যদি সামাজিক ভাবে কুসংস্কারাচ্ছন্নতা, অজ্ঞতা মুছে ফেলে সচেতনতা গড়ে তুলি; ব্যক্তি, গোষ্টি, লিঙ্গ, সামাজিক অবস্থান ভেদে বৈষম্যমুক্ত হই তাহলেই লক্ষ লক্ষ মানুষ মানসিক রোগী বা সমস্যাগ্রস্থ হওয়া থেকে বেঁচে যাবে। এর ফলে সুস্থ মানুষ সুস্থ জাতি গঠন করবে এবং সুস্থ জাতি সুন্দর ও সমৃদ্ধশালী দেশ গড়ে তুলবে। এর জন্য প্রয়োজন সর্বস্তরে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন।